সিডনিতে বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্রমঃবিকাশ এবং একুশে একাডেমীর ভূমিকা

কাইউম পারভেজ

প্রবাসের কোন প্রত্যন্ত প্রান্তরে যদি একজনও বাঙালি থাকে তবে সে স্বপ্ন দেখে কী করে তার মাতৃভূমিটাকে প্রবাসে নিয়ে আসা যায়। যখন দু'জন বাঙালি হয় সেখানে তারা স্বপ্ন সফলের পরিকল্পনা করে। আর যখন তিনজন হয় তখন শুরু হয়ে যায় স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ। আসলে যা বলতে চাইছি সঙ্গী সাথী সহযোগী পেলে দূর প্রবাসে বাঙালি উদ্বুদ্ধ হয় নিজ দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি আচার ধর্ম নিয়ে নিজস্ব এক ভূবন সৃষ্টি করতে। কেবল যে বাঙালিরাই তা করে তাও বলবো না বরং সব অভিবাসিদের মধ্যেই থাকে একই উৎসাহ উদ্দীপনা। তবে বাঙালির মত এতো আবেগী আর দেশপ্রেমী কোথায় আছে? এরা মায়ের ভাষার জন্য জীবন দিয়ে দেয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য লাঙল কলম হাতুড়ী ছেড়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয়।

সিডনির বাঙালিদের সেই একই ইতিহাসের ধারবাহিকতা। এ ভূখন্ডে বাংলাদেশীদের স্থায়ীভাবে বসবাস ঠিক কবে থেকে শুরু হয় নিশ্চিত করে বলা ভার তবে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার ছাত্রী সামিয়া খাতুনের পিএইচডি থিসিসসূত্রে জানা যায় ১৮৭০-এর দিকে জাহাজে করে বাঙালিরা পৌঁছেছিল অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে। বাঙালির সমুদ্রপথে দুস্তর পারাপারের এই অভিযানের ইতিহাস জানার সূত্রপাত ঘটেছিল অবশ্য একটি পুঁথিকে কেন্দ্র করে। ২০০৯ সালের জুনে সামিয়া খবর পান ব্রোকেনহিলের এক আদিবাসী গ্রামে একটি মসজিদ রয়েছে। সেখানে পুরোনো একখানা কোরআন শরিফও আছে। স্থানীয় কাউন্সিলরের সহযোগিতায় মসজিদের চাবি নিয়ে সামিয়া কোরআন শরিফটি যে বাক্সে রাখা, তার কাছে যান। মোড়কের ওপর ইংরেজিতে 'দ্য হলি কোরআন' লেখা দেখে প্যাকেট খুলেই আশ্চর্য হয়ে যান সামিয়া - আসলে ওটা কোরআন শরীফ নয় বাংলা হরফে লেখা পাঁচশো পাতার বাংলা কাব্য - কাছাছুল আম্বিয়া। 'বটতলা'র প্রকাশক কাজী সফিউদ্দিন অনূদিত আরবী কেসাসল আম্বিয়া হাদিসের অংশবিশেষ বাংলা কাব্যের ঢংয়ে লেখা। কলকাতার চিৎপুর রোডে ১৩০১ (১৮৯৪ ইং) সালে ছাপা। সেখান থেকেই অনুসন্ধান করতে গিয়ে সামিয়া জানলেন এদেশে বাঙালির আগমন ঘটে ১৮৭০ সাল নাগাদ (সামিয়া খাতুন, ২০১২)।

বাঙালির দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপ অভিযানের মতোই অস্ট্রেলিয়া অভিযানের শুরুটাও একই রকমের ছিল। অর্থাৎ, ব্রিটিশ জাহাজের লস্কর বা নাবিক হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বন্দরগুলোর কাছাকাছি এসেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেন তাঁরা। উত্তাল-ভয়াল সমুদ্র জয় করে তাঁরা মারী-ডার্লিং নদী সাঁতরে সিডনি, পার্থসহ বিভিন্ন বন্দরনগরে গিয়ে উঠতেন। অনেকে সেখানকার আদিবাসী নারীদের বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসতিও গড়ে নিয়েছিলেন (ইফতেখার মাহমুদ, ২০১৩)।

বিভিন্নসূত্রে জানা যায় ১৯৬২-তে পদ্মাপাড়ের বাঙালি হিসেবে প্রথম স্থায়ী অভিবাসী হয়ে এসেছিলেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী মাসুদুল করিম চৌধুরী যিনি আলমগীর চৌধুরী নামে অধিক পরিচিত। ভোলার মানুষ আলমগীর চৌধুরী চট্টগ্রামে ব্যবসা করতেন। ষাট দশকের গোড়ার দিকে একজন অস্ট্রেলিয়ান নারী হেলেন স্টাথ্যাম চট্টগ্রামে এক মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলেন। তখনই তাঁর পরিচয় আলমগীর চৌধুরীর সাথে। তারপর প্রণয় এবং বিয়ে। সে সুবাদেই স্পাউজ হিসেবে তাঁর আগমন। তখনো অস্ট্রেলিয়াতে অভিবাসন নীতি ছিলো হোয়াইট অস্ট্রেলিয়ান পলিসি। অর্থাৎ সাদা ছাড়া অন্যদের স্থান নেই। যাহোক ষাট দশকের শেষ থেকে এ নীতি ক্রমশঃ শিথিল করা হলো এবং শেষমেষ হুইটলাম সরকার ১৯৭৪-এ সে নীতির অবসান ঘটালেন। ১৯৬২ তে আলমগীর চৌধুরী এ দেশে জাহাজে করে এসেছিলেন এবং নেমেছিলেন ওয়েষ্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ফ্রিম্যানটালে। পরবর্তীতে ব্রিজবেন এবং শেষ জীবনে সিডনিতে বসবাস করতেন। ১৯৯০ সালে আলমগীর চৌধুরী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। রসিকতা করে অনেকে বলেন আলমগীর চৌধুরীই হলেন বাঙালিদের ক্যাপ্টেন কুক। ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন এসেছেন ছাত্র হিসেবে অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যাঁদের মধ্যে আছেন নজরুল ইসলাম এবং আলমগীর চৌধুরীর ভাই আজম চৌধুরী। নজরুল ইসলামই প্রথম সরাসরি অভিবাসন ভিসা এবং চাকরী

নিয়ে এদেশে আসেন ১৯৭০-এ একজন জিওলোজিষ্ট হিসেবে। সমসাময়িককালে ছাত্র হিসেবে যাঁরা পড়তে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রকৌশলী ড.আজীজুল হক, ড. আমিনুল হক চৌধূরী, ড. তৌফিক আহমেদ, ড. কামরুল হুদা এবং কৃষিবিদ ড. মোখলেসুর রহমান। এদেশে আসার পর একাত্তরে যখন জানলেন দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন এঁরা সবাই, নজরুল ইসলামের স্ত্রী ইয়াসমিনসহ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রবাসে স্বাধীনতার যুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং সমর্থন আদায়ে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। আন্দোলন শুরু করলেন। পাশাপাশি দাঁড় করালেন অস্ট্রেলিয়ার বুকে বাংলাদেশের প্রথম কোন বেসরকারী সংগঠন এবং নজরুল ইসলাম হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। (কাইউম পারভেজ, ২০১২)।

এই নামহীন সংগঠনটিই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়া নামে কার্যক্রম শুরু করে। সিডনি শহরে বাঙালির বৈঠকখানা ডিঙ্গিয়ে ভাষা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চ্চাও শুরু হয় এই বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়ার কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে। তখন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত লোকবলও ছিল অপ্রতুল। দিবস ভিত্তিক অনুষ্ঠান যেমন স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানই মূলতঃ ছিলো সাহিত্য সংস্কৃতির পরিধি। সে হিসেবেই কবিতা গান নাচ। এর পাশাপাশি প্রজন্মকে বাংলা ভাষা শিক্ষা ও ভাষার চর্চ্চার জন্য এ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে বাংলা স্কুল। এভাবেই চলছিলো কয়েক বছর। এর মাঝে বাঙালি অভিবাসিদের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বেড়েছে তেমনি বাঙালি বসতিও বিস্তৃতি লাভ করেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে উত্তর থেকে দক্ষিণে। ফলে দূরত্ব বিবেচনা এবং সময়ে মতের অমিলের কারণে পশ্চিম সিডনিতে গড়ে উঠলো বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস্ নামে আরেকটি সংগঠন ১৯৮৫ সালে। পূর্ব এবং পশ্চিমের এই দুই এ্যাসোসিয়েশন ঘিরেই চলতে থাকলো বাঙালির ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চ্চা। সে সময়ে যাঁরা সরাসরি ভাষা সাহিত্য সঙ্গীত কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন তাঁদের নামগুলোও উল্লেখ করা প্রয়োজন যদিও সবার নাম এ ক্ষুদ্র পরিসরে লিপিবদ্ধকরা সম্ভব নয়। যাহোক বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতির কর্মকান্ডের সাথে ছিলেন মহুয়া হক, নাসিম হুসাইন, রিতা করিম, লিলি গোমেজ, সামছিয়া সোলায়মান, আশীষ বাবলু, গোলাম মোস্তফা, শাহীন শাহনেওয়াজ, মহিউদ্দীন শাহীন, লরেন্স ব্যারেল, গাজী সাখাওয়াৎ আরিফ, লুৎফর রহমান শাওন, শাহজাহান বৈতালিক, আকিদুল ইসলাম, রহমতুল্লাহ, আবিদা আকিদ, রেহানা জামান, লাভলী মোস্তাফা, আনিসুর রহমান রিতু, মঞ্জুর আহমদ টুকু, আনোয়ার আকাশ, ড. মঞ্জুর হামিদ, নাসরিন হামিদ, শহীদুল আলম, আমীর বাবু, এহসানুল হক, নাসরিন গণি প্রমূখ। ওদিকে বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস-এর সাংস্কৃতিক কর্মীরা তখন মিজানুর রহমান তরুণ, আবদুল্লাহ আল মামুন, শহীদুজ্জামান আলো, ফায়েকা সাদেক, অভিজিৎ বড়ুয়া, পিয়াসা বড়ুয়া, উদয় শংকর বড়ুয়া, রুমী মুৎসুদ্দী, সিরাজুস সালেকীন, আতিক হেলাল, কাইউম পারভেজ, কবিতা পারভেজ, শামীম আরা সোহেলী, রুনু রাজ্জাক, বিলকিস রহমান, মানিজে আবেদীন, শারমিন সোমা, শাহেদ সুমন, সুজন প্রমুখ। তবে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে এ শিল্পীরা অনেকেই উভয় এ্যাসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত হতেন। এছাড়াও এ্যাসোসিয়েশনের গন্ডির বাইরে থেকেও অনেকে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছেন তাদের মধ্যে মকদুম আজম মাশরাফী, অজয় দাশগুপ্ত, বিরূপাক্ষ পাল, আবেদ চৌধুরী, ইদ্রিস খান, হারুন-অর-রশীদ আজাদ, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া, শামস্ রহমান, আবূ রেজা আরেফিন, অমিয়া মতিন, জন মার্টিন, মৌসুমী মার্টিন, রোখসানা রহমান, আনিসুর রহমান, রুবিনা হাসান লিমা, বাদল হাসান, তানিম হায়াৎ খান রাজিত, রাশেদুল কবির সুইটি প্রমুখ।

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে অভিবাসিদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে যত বেড়েছে তেমনি বেড়েছে প্রতিভাবানদের সারি। আর সেই প্রতিভাবানদের সংমিশ্রণে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির মান দিনকে দিন বেড়েছে আকর্ষণীয়ভাবে।

পরবর্তীতে এ্যাসোসিয়েশনের দুই ধারার বাইরে আরেকটি ধারা সিডনির বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ এবং প্রসারে রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়েছে সেটা হলো বঙ্গবন্ধু পরিষদ। এই বঙ্গবন্ধু পরিষদই আজকের সুবিশাল বৈশাখী

মেলাদ্বয়ের (অলিম্পিক পার্ক এবং টেম্পী) উদ্যোক্তা এবং এর প্রধান রূপকার প্রয়াত গাজী রুহুল হক উজ্জল। বঙ্গবন্ধু পরিষদ বারউড গার্লস্ হাইস্কুলে প্রথম এ মেলার শুরু করে ১৯৯২-তে। এ মেলাতেই জমে উঠতে থাকলো কবিতা পাঠের আসর, গীতি আলেখ্য, পথ নাটক, গণ-সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় এবং সেই সাথে স্মরণিকা (কাইউম পারভেজ, ২০০১)। এ্যাসোসিয়েশান গুলোর মত বঙ্গবন্ধু পরিষদও নিয়মিত শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করে আয়োজন করেছে এবং এখনো করছে নানান বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেখানে শিশু কিশোররা বাংলায় ছড়া বলছে, আবৃত্তি করছে, গান করছে, নাটক করছে।

বলছিলাম বৈশাখী মেলার কথা। এই বৈশাখী মেলাতেই ছোট্ট একটা টেবিলে গুটি কয়েক বই নিয়ে লুঙ্গিপরে মাথায় গামছা বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতেন নেয়ামুল বারি নেহাল। পাশে দন্ডায়মান তাঁর সহযোগী শামীম আল নোমান। এটাই বস্তুতপক্ষে আজকের সুবিশাল একুশে একাডেমীর আঁতুড় ঘর। এভাবে বছরের পর বছর নেয়ামুল বারি নেহাল মেলায় মেলায় ঘুরে বইয়ের মেলা সাজাতে সাজাতে একদিন নিজস্ব প্রাঙ্গনে (এ্যাশফিল্ড পার্ক) প্রথম শুরু করলেন একুশে বই মেলা মিশুক প্রকাশনী নামে ১৯৯৯ সনে। সেখান থেকেই পরবর্তীতে এ্যাশফিল্ড পার্কে একুশের বই মেলা। এক সময় তাঁরা ভাবলেন একুশের বই মেলা বলতে কেবল মেলাই মনে হয় কোন সংগঠন নয় এবং কম্যুনিটিরও সেটাই ছিলো চাওয়া তাই পরবর্তীতে এর নামকরণ হলো একুশে একাডেমী। শুরুতে শুধু বই বিকিকিনির মেলা হলেও পরবর্তীতে এটা সংগঠনে রূপ নিলো। আস্তে আস্তে সম্পৃক্ত হতে লাগলো সাহিত্য সংস্কৃতির মানুষজন। সংযোজন হলো শিশু কিশোরদের মাতৃভাষায় গান নাচ ছড়া আবৃত্তি এবং দিন জুড়ে একুশের গান কবিতা। এলো প্রভাত ফেরী, হলো শহীদ মিনার। বাংলাদেশের বাইরে প্রবাসে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্তম্ভ তৈরী হলো একুশে একাডেমীর নিরলস প্রচেষ্টায় এ্যাশফিল্ড পার্কে। একুশে একাডেমীর মঞ্চে তৈরী হলো কবিতার মঞ্চ।

কবিতার মঞ্চ যদিও এর আগেই তৈরী করেছিলো 'আমরা ক'জন মঞ্চ শ্রমিক' নামে একটি সংগঠন যাঁরা দর্শনীর বিনিময়ে সিডনিতে প্রথম কবিতা সন্ধ্যার আয়োজন করেছিলেন ১৯৯৪-তে। একুশে একাডেমী ছাড়াও কবিতার মঞ্চ তৈরী হয়েছে বঙ্গবন্ধু পরিষদসহ আরো অন্যান্য সংগঠনের অনুষ্ঠানমালায়।

সাহিত্য এবং পত্রপত্রিকা প্রকাশনার অঙ্গনেও সিডনির ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ এবং অহংকারের। এই শহরে প্রথম প্রকাশিত বাংলা সংকলনের নাম শাপলা যেটা হাতের লেখায় একবারই মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস্ থেকে। নামমাত্র এই সংকলনটি কয়েকটি কপি তৈরী হয়েছিল যা অনেকেরই নজরে আসেনি। তবে সংকলন অর্থে প্রথম সংকলন ধরতে হয় হাতের লেখায় 'সাঁকো" কে, আশীষ বাবলুর সম্পাদনায় এবং শাহীন শাহনেওয়াজ এবং শাহাদৎ হোসেনের সহযোগীতায় যা প্রকাশিত হয়েছিলো। এবং এর পরপর কয়েকটি সংখ্যা বের হয়েছিলো। আমি এমন এক সময়ের কথা বলছি যখন এ শহরে স্থানীয়ভাবে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত কোন কিছুই সম্ভব ছিলো না।

প্রথম মূদ্রিত নিয়মিত পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো মাসিক আভাস। এরপর প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে এলো সাপ্তাহিক স্বদেশ বার্তা। তারপর একে একে দেশকণ্ঠ, প্রবর্তন, প্রবাহ, আমরা বাঙালী, উঠোনে ধান শালিক, খেয়াঘাট, সঙবাদ দিন (কার্টুন পত্রিকা), দেশের খবর এবং সোনার বাংলা। একটা কথা এখানে না বললেই নয় - তা হলো সেই সময়ে বাংলাদেশী গ্রোসারী বলতে কেবল কেনসিংটনের রতন ভাইয়ের দোকান আর পরবর্তীতে ইস্টলেকস্-এ ফয়েজ ভাইয়ের দোকান এই ছিলো এ সকল পত্রপত্রিকার একমাত্র প্রাপ্তিস্থান অথবা ডাকযোগে নয়তো বাঙালিদের মেইল বক্সে রেখে যাওয়া। এ সকল পত্রপত্রিকার অধিকাংশ আজ আর নেই তবে এর বহরে যোগ হয়েছে বাংলা বার্তা, দেশ বিদেশ, মুক্তমঞ্চ, সুপ্রভাত সিডনি, সাদা কালোসহ আরো নিত্য নতুন পত্রপত্রিকা। আনন্দের কথা হলো এ পত্রিকাগুলো কলেবরে রঙে জৌলুসে আকর্ষনীয় এবং বিনামূল্যে সর্বত্রই পাওয়া যায়। সব সবার্বেই এখন একের অধিক গ্রোসারীর দোকান তাই আগ্রহী সকলের পত্রিকা পেতে কোন ঝক্কি পোহাতে হয় না।

এই সকল পত্রপত্রিকা ছাড়াও একুশে একাডেমীর সঙ্কলন মাতৃভাষাসহ বিভিন্ন সংগঠন বৈশাখী মেলা, জাতীয় শোক দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং নানান অনুষ্ঠানে বিশেষ সঙ্কলন প্রকাশ করে যাচ্ছে।

এই সকল পত্রপত্রিকায় নতুন পুরোনো লেখক ছাড়াও নতুন প্রজন্ম এবং নব্য অভিবাসী লেখকদের সন্নিবেশ ঘটেছে ব্যাপকভাবে যার ফলে প্রবন্ধ কবিতা গল্প কলাম সাহিত্য উপন্যাসের নবধারার সূচনা হয়েছে। সবার নাম এই পরিসরে বলা দূরূহ তবে যাঁরা মোটমুটিভাবে বহুল পরিচিত এবং যাঁদের অনেকেরই ভান্ডারে আছে বেশ কিছু প্রকাশিত গল্প উপন্যাস কবিতার বই তাঁদের মধ্যে আছেন আকিদুল ইসলাম, শাফিন রাশেদ, আশীষ বাবালু, লরেন্স ব্যারেল, আবুল হাসনাৎ, হায়াৎ মাহমুদ, ইসহাক হাফিজ, নাঈম আবদুল্লাহ, ডালিয়া নিলুফার, শাখাওয়াৎ নয়ন, নাজমুল আহসান শেখ, জন মার্টিন, নির্মল পাল, রতন কুন্ডু, শাহরিয়ার পাভেল, আবদুর রায্যাক, লুৎফর রহমান শাওন, কাইউম পারভেজ প্রমূখ।

পত্রপত্রিকার পাশাপাশি ইন্টারনেট ওয়েবপেজ গুলোও এক বিপ্লব ঘটিয়েছে সিডনিতে বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে এবং প্রসারে। সর্বপ্রথম এ মিডিয়া নিয়ে সাড়া জাগায় বাংলা-সিডনি.কম। এর পরপর যথাক্রমে সিডনিবাসি-বাংলা.কম, বাসভূমি.কম, অজবাংলা ডট.কম, কর্ণফুলী.কম, বাংলার কণ্ঠ.কম। এগুলোর দু'একটি এখন বন্ধ রয়েছে আবার নতুন কয়েকটির সংযোজন হচ্ছে বলেও আভাস পাচ্ছি।

বাংলা ভাষা সংস্কৃতির প্রসার এবং বিকাশে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখে যাচ্ছে বাংলা প্রসার কমিটি এবং বাংলা একাডেমী অস্ট্রেলিয়া। বাংলা প্রসার কমিটির নিরলস পরিশ্রমের ফসলে আজ নিউ সাউথ ওয়েলস্ এ একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে আমাদের বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা তাদের পাঠ্যসূচীতে বাংলাকে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়তে পারছে। সে কারণে বাংলা প্রসার কমিটি একের অধিক শনিবারের স্কুলও পরিচালনা করছে। তেমনি বেসরকারীভাবে বাংলা একাডেমী অস্ট্রেলিয়াও বেশ কয়েকটি বাংলা স্কুল পরিচালনা করছে যেখানে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকরা বাংলা শেখাচ্ছেন আমাদের বাঙালি প্রজন্মকে।

সেই সত্তর দশকের শুরুর দিকে এ শহরে যাঁদের হাত ধরে সঙ্গীত বাড়ীর বৈঠকখানা থেকে মঞ্চে এসেছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হেনরী গিলবার্ট, মহুয়া হক, চন্দনা গাঙ্গুলী প্রমূখ। পরবর্তীতে যখন এ্যসোসিয়েশন হলো তখন নতুন অভিবাসী শিল্পীরা তাতে যুক্ত হলেন। সঙ্গীতের মান পরিবেশনা আরো আধুনিক এবং শুদ্ধধারার হতে থাকলো। একসময়ে সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা নিজেরাই সঙ্গীতের দল বা গোষ্ঠী তৈরী করলেন আর সেখান থেকেই শুরু হলো সঙ্গীতের বৈচিত্রতা। উল্লেখযোগ্য সে দলগুলো প্রতীতি, সুধা নিঝর, ঐকতান, সুর ও ধ্বনি, লাল সবুজ ইত্যাদি। এর মাঝে ব্যান্ড সঙ্গীতেরও জনপ্রিয়তা বেড়েছে। সেই তাগিদে তৈরী হয়েছে ব্যান্ডের দল কৃষ্টি, টেম্পেস্ট্রা, স্বপ্ন এবং আরো অনেক।

পূর্বল্লেখিত দু'টি এ্যাসোসিয়েশন ছাড়াও আরো কিছু ছোট বড় সংগঠন অভিবাসনের বিস্তারের সাথে সাথে গড়ে উঠেছে যেখানে সঙ্গীত আবৃত্তি নৃত্য অভিনয়সহ ভাষা শিল্প সাহিত্যের সব অঙ্গন বিকশিত হয়েছে। সে সংগঠনগুলোর মধ্যে আছে যেমন, বাংলা সংস্কৃতি সম্মিলন পরিষদ, পূজা ও কালচার সোসাইটি (এঁরা নিয়মিতভাবে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী উদযাপন করেন), খ্রীস্টান ফেলোশিপ সোসাইটি, জিয়া পরিষদ, রংধনু, কবিতা বিকেল, কবিতা'র বিকেল, বসন্ত মেলা, বাংলা লোকমেলা প্রভৃতি।

পত্রপত্রিকা, অনুষ্ঠান এবং মঞ্চের বাইরে নিয়মিত টিভি এবং রেডিও অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমেও আমাদের বাংলা ভাষা সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার ঘটেছে এই শহরে। এসবিএস রেডিও থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সর্বপ্রথম বাংলাদেশীদের দ্বারা প্রচারিত রেডিও বেতার বাংলা। এরপর একে একে রূপসী বাংলা, ভয়েস অব বাংলাদেশ, রেডিও বাংলা অস্ট্রেলিয়া, একুশে বেতার, অজবাংলা রেডিও, পরশমণিসহ আরো অনেক। তবে এর কোন কোনটি এখন বন্ধ রয়েছে। বাংলার মুখ এ শহরে প্রথম বাংলা টিভি চ্যানেল। আপাততঃ সেটা বন্ধ থাকলেও পাশাপাশি আরেকটি টিভি চ্যানেল বিদেশবাংলা এখন ভীষণ জনপ্রিয়।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় সিডনিতে বাংলা ভাষা সাহিত্য সঙ্গীতের অঙ্গন কেমন করে বিন্দু থেকে বৃত্তে রূপ নিয়েছে। এক সময়ে এখানে শিল্পী পাওয়া যেত না বলতে গেলে হাতে পায়ে ধরে যারা কখনো মঞ্চে ওঠেননি তাদেরকে দিয়ে অনুষ্ঠান করতে হতো আর এখন হিট নিয়ে বাদ দিতে হয়। সেটাই আনন্দের। সেখানেই সার্থকতা।

বিভিন্ন সংগঠনের আমন্ত্রনে বাংলাদেশ ও ভারতের বিশিষ্ট বাঙালি ব্যক্তিত্ব শিল্পী লেখক বুদ্ধিজীবির পদচারনায় মুখর হয়েছে সিডনির সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গন (কাইউম পারভেজ, ২০০৩)। এঁদের পরিবেশনা, বক্তব্যে, এবং উৎসাহে অনেকখানি এগিয়ে গেছে সিডনির সাংস্কৃতিক অঙ্গন। সেই তাঁদের উৎসাহের কারণে সিডনির লেখক শিল্পীরা দেশে গিয়ে বই প্রকাশ করছেন, গানের সিডি বের করছেন ঢাকার টিভি চ্যানেলের জন্য নাটক তৈরী করছেন। আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন তেমনি প্রথিতযশা দুই লেখক শিল্পী অধ্যাপক ইন্দ্রমোহন রাজবংশী এবং দীপ্তি রাজবংশী। তাঁদের কাছ থেকেও আমরা আজ পাবো উৎসাহ এবং এগিয়ে যাবার প্রেরণা।

পরিশেষে যে কথাটি বলতে চাই তা হলো এই যে এতো কিছু আমরা করছি এই যে বিন্দু থেকে বৃত্তে চলে এসেছি, এর সবটার মধ্যেই কী আমার ভাষা সাহিত্য সঙ্গীত সংস্কৃতি বলবৎ আছে? এতো বাংলা ভাষা সাহিত্য সঙ্গীত চর্চ্চার পরও আমার প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষাটি আছে তো? ওরা কী বাংলায় কথা বলে? বলতে চায়? চেষ্টা কী করে? ওর ঘরে বাংলা ভাষার চর্চ্চা কী আছে না ইংরেজীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে? এ প্রশ্ন আমার নিজের কাছেও। এখনো বাঙালি আছি তো? একটা বড় সংস্কৃতির কাছে ছোট সংস্কৃতির সহ-অবস্থানের যেমন আশীর্বাদ আছে তেমনি অভিশাপও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই ছোট সংস্কৃতিটা বড় সংস্কৃতিতে বিলীন হয়ে যায়। যেমনটি শুরু হয়েছে আমাদের বাংলাদেশেও। আজকাল মেহেন্দী নাইটও ঢুকে পড়েছে আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান গুলোতে। হিন্দি সংস্কৃতিতে এখন ছয়লাব দেশ।

এখানে এ বৈরী পরিবেশে সে চ্যালেঞ্জটা আরো প্রখর। তার মোকবেলা করতে আমাদের এই সব সংগঠন গুলো কাজ করার চেষ্টা করছে যদিও কেউ কেউ পিছিয়ে যাচ্ছে। সেকারণে একুশে একাডেমী এখনো অনন্য- উন্নত মম শির। আমাকে এ প্রবন্ধ লেখার ও পাঠ করার সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি এ কথা বলছি না, বলছি তার জন্ম থেকে দেখা একুশে একাডেমীর কার্যক্রম থেকে। কারণ এখনো এর মধ্যে অপসংস্কৃতি প্রবেশ করতে সাহস পায়নি। পাবেও না কোনদিন। সে আশা নিয়েই বলছি একুশে একাডেমী দীর্ঘজীবি হোক। একুশে একাডেমী হোক আলোকবর্তিকা।

প্রবন্ধটি তৈরীতে সাহায্য নেয়া হয়েছে:

- মরুভূমিতে বাংলা কাব্য: সামিয়া খাতুন; সংবাদ প্রতিদিন, কলকাতা ১২ ডিসেম্বর ২০১২
- দেড়শো বছর আগে বাঙালির অস্ট্রেলিয়া অভিযান; ইফতেখার মাহমুদ, দৈনিক প্রথম আলো; ৫ মে ২০১৩
- অস্ট্রেলিয়া ডে: কাইউম পারভেজ; অল্প স্বল্প গল্প, বইপত্র প্রকাশন ঢাকা বাংলাদেশ, ২০১২ পৃঃ ১৩
- সিডনির বৈশাখী মেলা: কাইউম পারভেজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা বাংলাদেশ, ১৩ মে ২০০১
- একদিন, কোন একদিন - সেইদিন: কাইউম পারভেজ; বাংলা সংস্কৃতি সম্মিলন পরিষদ, যাহা চাই যেন জয় করে পাই, সিডনি, ২০০৩
- ওরা জানে না সেই মহাপুরুষ: কাইউম পারভেজ; দৈনিক জনকণ্ঠ; ঢাকা বাংলাদেশ ১৫ আগস্ট ২০০১

একুশে একাডেমী, অস্ট্রেলিয়া'র বিশেষ সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ; ২৬ অক্টোবর ২০১৪